‘মি টু’ : নতুন এক আন্দোলনের দিশা

চিররঞ্জন সরকার

যুগের ধারার সঙ্গে আন্দোলন, ভাবনা, স্বর, কৌশল সবই পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নতুন প্রতিবাদ, নতুন স্বর যে এর মাধ্যমেই প্রকাশিত ও বিকশিত হবে এটাই স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই; যেমন, গেল বছর সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হওয়া যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে পরিচালিত ‘মি টু’ আন্দোলন!

রাজনীতি আর অর্থনীতির বাইরে ২০১৭ সালে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলা একটি ইস্যু ‘মি টু’। আক্ষরিক অর্থেই আলোড়ন। ‘মি টু’ বাংলায় ‘আমিও’— এই ছোট্ট একটি হ্যাশট্যাগ যেন শত-সহস্র ম্লান, মূক মুখে লহমায় দৃপ্ত ভাষা জুগিয়ে দিয়েছে। এক মার্কিন অভিনেত্রী স্ফুলিঙ্গটা ছুড়েছিলেন। বারুদের সুবিশাল স্তূপ অলক্ষ্যে যেন প্রস্তুতই ছিল, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ মহাপৃথিবীর প্রায় সব প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠল— ‘মি টু’; আমিও...! টুইটার থেকে ফেসবুকের দেয়াল ভরে গেছে মাত্র এই দুটি শব্দে। শব্দ দুটি বুঝিয়ে দিয়েছে, সারা বিশ্বে কত নারী এবং পুরুষ তাদের জীবনে কখনো না কখনো ঘটে যাওয়া যৌন হয়রানির যন্ত্রণার পাহাড় বয়ে চলেন।

১৯৯৭ সালে সমাজকর্মী তারানা বুর্কির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন মায়ের প্রেমিকের হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া এক কিশোরী। ওই কিশোরীকে বুর্কি বলতে চেয়েছিলেন ‘মি টু’ (আমিও)। সেসময় বুর্কি তা বলতে পারেন নি। তবে শুরু করেছিলেন এক প্রচারণা। ২০১৭ সালের ১০ অক্টোবরে নিউইয়র্ক টাইমসে চলচ্চিত্র প্রযোজক হার্ভি ওয়েনস্টেইনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। এর পাঁচদিন পর ১৬ অক্টোবর আমেরিকান অভিনেত্রী অ্যালিসা মেলিনো টুইটারে লিখেন, “আপনি যদি যৌন হয়রানি অথবা আক্রমণের শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে এ টুইটের প্রত্যুত্তরে ‘মি টু’ লিখুন।” তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চালু করেন #মি টু (#MeToo) প্রচারণা। দিন না কাটতেই ভাইরাল হয়ে পড়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদের এ নতুন ভাষা। সামাজিক রীতিনীতির নামে অকারণ সংকোচ ভেঙে, লোকলজ্জার ভয় উপেক্ষা করে সারা পৃথিবীতে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন লাখ লাখ নারী, যাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পুরুষরাও।

অনেক দিন ধরে শিরোনামে আসছিল হলিউডের নামী প্রযোজক হার্ভি ওয়েনস্টেইনের কেলেঙ্কারির কথা। ৬৪ বছরের প্রৌঢ় লোকটি হলিউডে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নারীকে যৌন হয়রানি করে এসেছেন। এত দিন কেউ সেভাবে মুখ খোলেন নি। কিন্তু একজন বলার পরে খুলে গিয়েছে প্যান্ডোরার বাক্স। নামী তারকা থেকে হার্ভির প্রযোজনা সংস্থায় কর্মরত নারী— সবাই একযোগে বলেছেন, কোথায় কীভাবে হার্ভির লালসার শিকার হয়েছেন তাঁরা। উঠেছে ধর্ষণের অভিযোগও। অভিযোগের তোড়ে বাফটা, অস্কারের মতো ঐতিহ্যবাহী সংস্থার সদস্যপদ হারিয়েছেন হার্ভি। নিজের সংস্থাও তাঁকে ছেঁটে ফেলতে দ্বিধা করে নি। তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রীও।

হার্ভে ওয়েনস্টাইনের একের পর এক যৌন নিগ্রহের কেচ্ছা যখন বাইরে আসছিল, যাবতীয় সংশয় ঝেড়ে ফেলে নিগৃহীতরা প্রকাশ্যে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছিলেন। আলোর মতো অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়েছে দুনিয়ার নারীর সচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সম্পূর্ণ অসংগঠিত প্রতিবাদের তির। তাতে বিদ্ধ হয়ে চাকুরি খুইয়েছেন তাবড় সেলিব্রিটি, মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সহস্র বিকৃত মুখ, অবশ্যই প্রভাবশালী পুরুষের। মানবেতিহাসে এহেন চমকপ্রদ আন্দোলন এর আগে কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্ষসেরার খোঁজ করতে গিয়ে টাইম ম্যাগাজিন এবার তাই কোনো ব্যক্তিবিশেষের দিকে তাকানোর প্রয়োজনই অনুভব করে নি, সেরার শিরোপা উঠেছে এমন অদৃষ্টপূর্ব আন্দোলনের মাথায়ই। টাইম ম্যাগাজিন তাদের 'পারসন অব দ্য ইয়ার' সংখ্যায় সেসব নারীকে তাদের প্রচ্ছদে জায়গা দিয়েছে, যাঁরা 'মি টু' আন্দোলনে সরব হয়েছেন। সেসব নারীকে তারা 'নীরবতা ভাঙল যাঁরা' শিরোনামে অ্যাখ্যায়িত করেছে। এর চেয়ে সহজ, সংগত মনোনয়ন বোধহয় অন্য কিছু হতেও পারত না।

'মি টু' আন্দোলনে বিশ্বাসীদের কথা হলো, একজন যৌন হয়রানির শিকার নারী চুপ না থেকে ঘটনাটা প্রকাশ করে সেই পুরুষকেই সমাজের মানুষের সামনে লজ্জিত করবে। তার বিরুদ্ধে সামাজিক, সম্মিলিত ও আইনি পদক্ষেপ নেবে। 'মি টু' আন্দোলনের ঢেউ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ৮৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক নামকরা অভিনেত্রী, সংবাদ উপস্থাপিকা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় করা যৌন হয়রানির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ফলে অনেক পশ্চিমা রাজনীতিবিদ, অভিনেতা ও পরিচালক বিচারের সম্মুখীন হন। আবার অনেকেই তাঁদের কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

বিবিসির এক প্রতিবেদন মতে, এ আন্দোলন নারীদের আগের চেয়ে অনেক বেশি সরব করে তুলেছে এবং এখন অনেক বেশি সংখ্যক নারী যৌন হয়রানির প্রতিকার চাইতে এগিয়ে আসছে বলে জানায় আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যারা যৌন হয়রানির শিকার নারীদের সেবা দিয়ে চলেছে। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান তাদের সেবার আওতা বাড়াতেও বাধ্য হচ্ছে। কারণ প্রতিদিন যে পরিমাণ অভিযোগ এসেছে, তাতে বিদ্যমান লোকবল দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। ব্রিস্টল ক্রাইসিস সেন্টারের কর্মী এমিলি লসন মনে করেন, 'মি টু' আন্দোলনের কারণেই নারীরা এখন অনেক বেশি হারে মুখ খুলছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আগামী দিনগুলোতে এ আন্দোলন সব প্রতিষ্ঠানকে নারীদের জন্য আরো সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বাধ্য করবে।

'মি টু'-এর পোস্টগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অনেক পুরুষও। এটা একটা ইতিবাচক দিক। কারণ এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত যেহেতু পুরুষ, তাই পুরুষের বক্তব্য বা সমর্থন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'মি টু' আন্দোলন ছিল 'ক্ষমতাধর' পুরুষের যৌন লালসা, অত্যাচার আর নিগ্রহের বিরুদ্ধে। এটা শুরু হয়েছিল আমেরিকায়। দেখা গেল ব্যাধিটি সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। দুনিয়ার সব দেশের প্রায় সব পেশাই কম-বেশি এতে আক্রান্ত।

'মি টু' আন্দোলনটি কেবল আলোচনা আর ব্যক্তিবিশেষের দুষ্কর্মের কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি, মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহার এবং ক্ষমতার অলিন্দে নারী-পুরুষের বৈষম্য হয়ে দাঁড়ায় প্রধান উপজীব্য। এই ভার্চুয়াল আন্দোলন একটি জানা সত্যকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বোঝা যায়, পুরুষের নিগ্রহমুক্ত হয়ে জীবনধারণ করছেন এমন নারী এই পৃথিবীতে নেহাতই সংখ্যালঘু। আবারও প্রমাণিত হলো যে, প্রতিটি দেশে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে ঘটে চলেছে নারী নির্যাতন। এটি যে কেবল ওয়েনস্টাইনের মতো প্রভাবশালী দানবদের হাতে হচ্ছে তা নয়, হচ্ছে পারিবারিক স্বজন, বন্ধু, সহকর্মী, তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীদের হাতেও। এদের মধ্যে আছেন নারীবাদে বিশ্বাস করা শুভানুধ্যায়ীও।

'কাস্টিং কাউচ'— হলিউডে শুধু নয়, সমস্ত সিনেমা জগতেই অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দবন্ধ। অসহায়তার সুযোগ নিতে উদগ্র অনেকে, অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন সমঝোতার আখ্যানও তাই অগণিত। অনেকেই অনেক কিছু জানেন, কিন্তু কেউ যেন কিছুই জানেন না। আর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবহমান কাল ধরে শোষণ চালিয়ে যান হার্ভি ওয়েনস্টেইনের মতো দুর্বৃত্তরা। আর যৌন নির্যাতনের ঘটনা শুধু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেই নয়, জীবনের অন্যান্য সরণিতে বা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সংকট সমপরিমাণে বাস্তব। সব বয়সে, সব পেশায়, সব সমাজেই অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের শিকার অসংখ্য-অগণিত নারী। বুক ফাটছিল, তবু মুখ ফুটছিল না। মাত্র একটা স্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। লোকলজ্জায়, সামাজিক সংকোচে রুদ্ধ ছিল যে দ্বার এত দিন, সে দ্বার যখন অনর্গল হয়, তখন অল্প সময়েই উগরে ওঠে অনেক গরল। যদিও সব আবর্জনা সাফ হতে এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা দরকার।

আমেরিকা থেকে ভারত-বাংলাদেশেও এর ঢেউ ছুঁয়েছে। এখানে যেন জমিটা তৈরিই ছিল। যৌন হয়রানির বিষয়টা আমাদের দেশে সবসময় আলোচিত বিষয়। অ্যালিসার টুইট মিলিয়ে দিয়েছে দুই পৃথিবীকে। কেউ শৈশবে পরিবারের মধ্যে, কেউ বড়ো হয়ে বাসে-মার্কেটে, কেউ-বা কর্মস্থলে— যৌন হয়রানির ইতিবৃত্তও খুব একরকম। চেনা কিছু অভিজ্ঞতাই ঘুরে ফিরে যেন এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একজনের অভিজ্ঞতা পড়ে চমকে গিয়েছেন অন্য জন। এ যেন তারই কথা!

যৌন হয়রানি নিয়ে আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজের নারীদের নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা সবসময় থাকে। এখানকার সমাজ-বাস্তবতায় আমাদের দেশে আক্রান্তের নাম পর্যন্ত বলা যায় না। সেই আড়ালটা ভাঙার প্রক্রিয়া নারীরাই শুরু করেছেন, এটা সাধুবাদযোগ্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— প্রত্যেকের মনে হয়েছে, আমি একা নই। এটা যেন একটা কালেকটিভ ভেন্টিলেশন। সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে বলা শুরু হলেও এই প্রবণতা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলেই ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে যৌন হয়রানি বা ধর্ষণের ঘটনা পত্রিকায় প্রতিদিনকার চিত্র। বাদ যাচ্ছে না ৫ বছরের শিশু কিংবা ৪৫-৫০ বছর বয়সী নারীও। যৌন হয়রানির অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছেন অনেক নারী। এর বড়ো একটি কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো মেয়ে যখন যৌন হয়রানির শিকার হয়, তখন আমরা ছেলেটিকে দোষারোপ না করে

দোষারোপ করি মেয়েটিকে, তার পোশাক-পরিচ্ছদকে। কেন মেয়েটি ঘর থেকে বের হলো ও কেন সে ওইস্থানে গিয়েছিল, না গেলে তো এই ঘটনা ঘটত না— ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্য করি। কিন্তু আমরা যদি নারীকে দায়ী না করে, দোষী পুরুষকেই দায়ী করতে পারতাম ও সামাজিকভাবে তাকে হেয় করতে পারতাম, তাহলে যৌন হয়রানির সংবাদ ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় রঙিন কলামে ছাপা হতো না। ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে, বিষ খেয়ে আত্মহনন করতে হতো না অনেক কিশোরী ও নারীকে।

আশার কথা হচ্ছে, 'হ্যাশট্যাগ মি টু' আন্দোলনের এটুকু সাফল্যেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলে থেমে যেতে চান নি কেউ। হলিউডের অভিনেত্রীরা শুধু যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেই নিজেদের দায়িত্ব সারেন নি। বরং বিষয়টিকে আরো সামনে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে ভেবে 'টাইমস আপ' উদ্যোগ নিয়েছেন। এই তালিকায় হলিউড অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ থেকে হালের এমা স্টোন পর্যন্ত শামিল হয়েছেন। সব মিলিয়ে তিন শতাধিক অভিনেত্রী, লেখক ও পরিচালক এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় পুরো এক পাতার বিজ্ঞাপন দিয়ে 'টাইমস আপ' উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারা বলেছে, এখনো অনেক নারী অসহায় অবস্থায় আছেন। হরহামেশা তাঁদের যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। তাঁদের কথা কেউ বলে না। অসহায় এই মানুষগুলোর কথা কারো কানে পৌঁছায় না। গণমাধ্যম যেন সেসব নারীর কথা বলে, বিজ্ঞাপনে সে আর্তি জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক 'সংহতি চিঠি'তে টাইমস আপ বলছে, 'আমরা সেসব অসহায় নারীর পাশে দাঁড়াতে চাই, আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করতে চাই; যারা কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার। সেটা হতে পারে কৃষিকাজে যুক্ত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে যৌন হয়রানির শিকার কৃষাণী, অতিথির কাছে হয়রানির শিকার হওয়া গৃহ তত্ত্বাবধায়ক নারী, প্রতিটি হোটেলে ক্রেতার অশালীন দৃষ্টির শিকার নারীকর্মী।' তবে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার পুরুষের পাশেও আইনি সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছে তারা।

এই উদ্যোগ সফল করতে দেড় কোটি ডলারের তহবিল গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এক কোটি ৩০ লাখ ডলার পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেছে। নাটালি পোর্টম্যান, হ্যালি বেরি, জুলিয়ান মুর, নিকোল কিডম্যান, সুসান সারান্ডন, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সেল পিকচার্সের প্রধান ডোনা লংলি, নারী অধিকারকর্মী গ্লোরিয়া স্টেইনেম, আইনজীবী ও সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামার চিফ অব স্টাফ টিনা চেন ও নাইকি ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি মারিয়া ইটেলসহ আরো অসংখ্য নারীর প্রত্যক্ষ অবদানে তহবিলে এই অর্থ জমা পড়েছে। এগুলো আশার দিক।

তবে 'মি টু' আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেক মেয়ে দায়িত্বজ্ঞান খুইয়ে কোনোরকম প্রমাণ দাখিল না করে অপছন্দের পুরুষ সম্পর্কে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নিয়েছেন। অন্যায়ভাবে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে

অনেককে। তাঁদের সামাজিক সম্মান মাটিতে মিশে গেছে। অভিযুক্তরা অনেক ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রাপ্য সুযোগটুকুও পান নি। অভিযোগের প্লাবনে চোখ রেখে বিভ্রম হচ্ছিল এঁরা নিজেদের অভিযোগকে বিচার বা সাজার বিকল্প হিসেবে ধরে নিচ্ছেন কি না। স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতেই চাকরি খুইয়েছেন অনেকে। অনেকে আবার বিকল্প খুঁজে না পেয়ে নিজেরাই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। অভিযোগ আর আইনের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন, আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে সে কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন অনেকেই। এই দিকটি ছিল এমন যুগান্তকারী আন্দোলনের অন্যতম দুর্বলতা।

তাতে অবশ্য আন্দোলনের গুরুত্বহানি হয় না একেবারেই। নারী-জীবনের, বিশেষ করে কর্মজীবী নারীর জীবনের যে গ্লানির দিকটি পুরুষ এতদিন প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় নি, এই আন্দোলন সেটাকে বে-আব্রু করে দিয়েছে। নারীর প্রতি যৌন হয়রানি কতটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই বৃহৎ ছবিটাই যে শুধু বাইরে বেরিয়ে এসেছে তা নয়, এর ফলে তাঁদের কর্মজীবন কীভাবে নষ্ট হয় বা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় সেটাও আমরা জানতে পেরেছি। অবশ্যই এটা সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেটের কল্যাণে। কেননা এখন আমরা বাস করছি এমন এক যুগে, যেখানে ব্যক্তির মতপ্রকাশ বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপরে আর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

সবাই সেই সুযোগ ও স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করেছেন এমন নয়, সেটা প্রত্যাশিতও হয়ত নয়, কিন্তু কিছুকাল আগেও যে এই ধরনের বিশ্বজোড়া আন্দোলনের কথা ভাবা যেত না সেটা সর্বাংশে সত্য। ইংল্যান্ডের নারীবাদী আন্দোলনের এক নেত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন, 'আনটিল দ্য ইন্টারনেট কেম অ্যালং উই ওয়্যার নট হ্যাভিং দিস কনভার্সেশনস অ্যাবাউট হোয়াট ইট ইজ লাইক টু বি এ ওমেন, হোয়াট ইট ইজ লাইক টু ওয়াক ডাউন দ্য স্ট্রিট অ্যান্ড বি হ্যারাসড অ্যান্ড ক্যাট-কলড। উই ডিড নট নো অ্যাবাউট দ্য আইডিয়া অব এভরিডে সেক্সিজম।' প্রশ্ন হলো, ইকোনোমিস্ট যার নাম দিয়েছিল 'হারিকেন হার্ভি', এর প্রভাব কি আদৌ সুদূরপ্রসারী হবে? নাকি প্রাকৃতিক ঝড়ের মতোই সাময়িক লণ্ডভণ্ডের পরে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কে সেই পুরোনো স্থিতাবস্থাই ফিরে আসবে, দৈনন্দিন নিগ্রহের অভিজ্ঞতায় কোনো অদল-বদলই হবে না?

ইতিহাসের শিক্ষা হলো সমাজে নতুন কোনো অভ্যাস দানা বাঁধার আগে কয়েকটি ছোটোখাটো পরিবর্তন তার জমি তৈরি করে দেয়। ২০১৭-এর 'মি টু' আন্দোলন সেরকমই একটি পরিবর্তন, যা এর আগে দুনিয়া এভাবে কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। ফলে একেবারেই কিছু হবে না, যেমনটি চলছিল তেমনটিই চলতে থাকবে এতটা নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। অন্তত আমেরিকায় আমরা কিছুদিন আগেই দেখলাম, নারী নিগ্রহে অভিযুক্ত রিপাবলিকান প্রার্থী রয় মুর সিনেট নির্বাচনে হেরে গেলেন আলাবামায়। এমন একটি আসনে যেখানে রিপাবলিকানরা জন্মেও হারে নি। হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু চেতনার স্তরে এই হারিকেন যে দুরপনেয় প্রভাব ফেলবে এ কথা অনস্বীকার্য। কেননা 'মি টু' আন্দোলন এই প্রথম প্রমাণ করে দিয়েছে হাটের মধ্যে যে কোনো কুলাঙ্গারকেই উলঙ্গ করে নামিয়ে দেওয়া যায়। এমন বেইজ্জতি করা যায়, যা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আর অবশিষ্ট থাকে না।

ক্ষমতা কিংবা বৈভব দিয়ে যে কোনো অপরাধ কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলা যায়, এমত চালু-ধারণার মূলেই নাড়া দিয়ে দিয়েছে এই আন্দোলন।

তবে আমাদের সতর্ক হতে হবে, 'মি টু' বলেই যেন কথা শেষ না হয়ে যায়। এমন আপত্তিকর কিছু ঘটলে বাস্তবেও গলাটা তুলতে হবে। মনে রাখা দরকার যৌন হয়রানি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এটা শুধু যৌন হয়রানিও নয়। এর সঙ্গে ক্ষমতার বড়ো সম্পর্ক রয়েছে। ফেসবুক-টুইটারে 'মি টু' বলে কিংবা কারো নামে কেবল একতরফা অভিযোগ আরোপ করে বিষয়টাকে যেন লঘুও করে ফেলা না হয়। আরেকটি কথা, নারীর প্রতি যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে পুরুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। নারীরা নিজেদের জন্য কী করছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন দেখার সময় এসেছে পুরুষরা এগিয়ে আসছে কি না। আপনি সাধু হন আর শয়তান হন, দায় আপনাকে নিতেই হবে। শয়তান হলে তওবা করতে হবে। আর সাধু হলে শয়তানের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

চিররঞ্জন সরকার নলেজ ম্যানেজমেন্ট আর্কাইভ অ্যানালিস্ট, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ প্রোগ্রাম, ব্র্যাক।
chiroranjan@gmail.com